গল্পের পরশুরাম

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় কৌতূক-রসের লেখক অপেক্ষাকৃত কম। পাশাপাশি এও স্বীকার করে নেওয়া ভালো, হাসির লেখার পাঠকও কম। অনেকেরই ধারণা গভীর চিন্তা ও বোধের ছাপ হাসির গল্পে নেই। বলাবাহুল্য, এ ধরনের ভাবনা অধিকাংশ সময়েই সঠিক নয়। আসলে অনেক সময়-ই দেখা গেছে হাসির গল্প লিখতে গিয়ে লেখক এবং লেখা দু-ই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। এরকম কিছু লেখা পাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো-বা হাসির গল্পের প্রতি অনীহা তৈরি হয়েছে কারও কারও। আবার আদিরস কুরুচিকর ইঙ্গিত ভাঁড়ামি দিয়ে অনেক সময় পাঠককে হাসানোর চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের লেখারও অভাব নেই বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসকে ভাঁড়ামি ও আদিরসের নীচতা থেকে প্রথম জাতে তুলেছেন সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র। তিনিই দেখিয়েছেন সাহিত্যে হাস্যকৌতুক আমদানি করতে হলে গভীর মননশীলতার প্রয়োজন। চিন্তাশীল দার্শনিকের পক্ষেই সম্ভব রুচিকর মার্জিত ও পরিমিত হাস্যরসের শিল্পিত মিশেল। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এরকম চিন্তাশীল দার্শনিক কৌতুকরস-শিল্পী অপেক্ষাকৃত কম হলেও দুর্লভ নয়। ত্রৈলোক্যনাথ প্রভাতকুমার পরশুরাম শরদিন্দু বিভূতিভূষণ (মুখোপাধ্যায়)— এরকম আরও অনেকের নামই করা যায়।

হাসির লেখক হিসেবে যাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি তিনি অবশ্যই পরশুরাম। ছোটগল্পের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাব একটু দেরিতে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতটা দেরিতে গল্প লেখা শুরু করছেন একজন লেখক, এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, প্রথম গল্পেই তিনি চমকে দিয়েছিলেন পাঠককে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এরপর একটার পর একটা গল্প লিখে গেছেন সমান দাপটে। আর এভাবেই পরশুরাম হাস্যরস সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।

লেখকের গবেষণার বিষয় বাংলা লিটল ম্যাগাজিন এবং সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ— যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল, বাংলা লিটল ম্যাগাজিন, উৎপল দত্ত, পথের পাঁচালির আঁকেবাঁকে, আরণ্যকের আলোছায়া। biswajitpanda1974@gmail.com

বিয়াল্লিশ বছর। এতদিন ধরে গল্প লেখার জন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সাহিত্য সৃষ্টির মানসিক উদ্যোগ চলছিল— এমনটাও বলা যায় না। কারণ সেই অর্থে তাঁর জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন— "জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুবই কম। কর্মক্ষেত্রে (বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর অফিসে) যাদের সঙ্গে মিশেছি, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে ব্যবসায়ী আর দোকানদার। লিখতে গেলে অনেক বেশি দেখতে হয়। আমার যা দেখা তা ওই রামায়ণ মহাভারত পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে।"

পরশুরামের এই স্বীকারোক্তির নিরিখে স্মরণ করা যায় রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের অনুষঙ্গে, পৌরাণিক আবহে লেখা গল্পগুলির কথা। এই ধরনের প্রথম লেখা গল্প 'জাবালি'। তাছাড়া 'হনুমানের স্বপ্ন', 'প্রেমচক্র', 'দশকরণের বাণপ্রস্থ', 'তৃতীয়দ্যূতসভা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'বাল্যখিল্যগণের উৎপত্তি', 'কর্দম মেখলা' ইত্যাদি গল্পগুলি পৌরাণিক আবহে লেখা। কিন্তু শুধু আবহটাই পুরাণের। কখনও পুরাণ থেকে দুয়েকটি প্রসঙ্গ বা চরিত্রের নামগুলিই গ্রহণ করেছেন পরশুরাম। কাহিনি ও বিন্যাস তাঁর নিজস্ব। নিজের মতো পুরাণের ব্যাখ্যা করেননি, নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন পুরাণের। আর সেই পুরাণ-ই পরশুরামের গল্প। তা পরশুরামের নিজস্ব পুরাণ। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

'তৃতীয়দ্যূতসভা' গল্পে লেখক মহাভারত-অনুসরণে শকুনি-যুধিষ্ঠিরের দুটি দ্যূতসভার উল্লেখ করে বলেছেন— "অনেকেই জানেন না যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে যুধিষ্ঠির আরও একবার শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারত থেকে তৃতীয় দ্যূতপর্বোধ্যায়টি কেন বাদ দিয়েছেন তা ব'লা শক্ত। হয়তো কোন রাজনীতিক কারণ ছিল, কিংবা তিনি ভেবেছিলেন যে আসন্ন কলিকালে কুটিল দ্যূতপদ্ধতির রহস্যপ্রকাশ জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর হবে।" এরপর লেখক তৃতীয়দ্যূতসভার বর্ণনা দিয়েছেন। এ ধরনের গল্প লেখার সময় পরিবেশকে পুরাণাশ্রিত করে তোলার জন্য মাঝে মাঝেই পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। যেমন—

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষতঃ।।

(অর্থাৎ, পণ ঘোষণা শুনেই শকুনি নিকৃতি (শঠতা) আশ্রয় ক'রে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন— জিতলাম।)

আবার,

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণীভিঃ ক্রিয়তে যত্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।।

(অর্থাৎ, অপ্রাণী নিয়ে যে খেলা তাকেই লোকে দ্যূত বলে, আর প্রাণী নিয়ে খেলার নাম সমাহ্বয়।)

'পঞ্চপ্রিয় পাঞ্চালী' গল্পে—

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্যা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী
মাতেব পরিপাল্য চ পূজ্যা চ স্বসা।।

(—আমাদের এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী, মাতার ন্যায় পরিপালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাননীয়া।)

পরশুরামের এই নবপুরাণে, নবমহাভারতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও শঠতার আশ্রয় নেন পাশাখেলায় জয়লাভের জন্য। আবার, মহর্ষি জাবালি দেবসভায় বলতে পারেন : "হে সুধীবৃন্দ, আমি নাস্তিক কি আস্তিক তাহা আমি নিজেই জানি না। ... আমার মার্গ যত্রতত্র, আমার শাস্ত্র অনিত্য, পৌরুষেয়...।"

এই গল্পগুলি লেখার ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তাঁর রামায়ণ মহাভারত চর্চার ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এই পুরাণাশ্রিত গল্প ছাড়াও আরও অনেক গল্প আছে, তার পরিমাণই বেশি। পরশুরামের জনপ্রিয় গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র রামায়ণ মহাভারতের অনুষঙ্গে লেখা। এই ধরনের গল্পের অধিকাংশই 'হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প' এবং 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' সংকলনের অন্তর্গত। পরশুরামের জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি প্রথম দুটি গল্পসংকলন 'গড্ডলিকা' ও 'কজ্জলী'-র অন্তর্গত। উক্ত দুটি গ্রন্থে মাত্র একটি পুরাণাশ্রিত গল্প 'জাবালি' সংকলিত।

পূর্বোক্ত স্বীকারোক্তিতে পরশুরাম বেঙ্গল কেমিক্যাল অফিসের কথা বলেছেন। কিন্তু আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গার উল্লেখ করেননি, যেখান থেকে তাঁর অধিকাংশ গল্পের রসদ সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর লেখক জীবনের মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পৈতৃক বাসভবনের আড্ডা। এখান থেকেই সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। নানা রকম মানুষকে দেখেছেন। এই আড্ডার অন্যতম সদস্য শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার একটি লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা উদ্ধৃত করছি—

> ১৪ নম্বর পার্শীবাগানে একটি বিরাট আড্ডা বসিত। পরশুরামের গল্পে ইহা ১৮ নম্বর হাবসীবাগান বলিয়া পরিচিত। ১৪ নম্বর ছিল বসু ভ্রাতৃগণের পৈতৃক বাসভবন। চারি ভ্রাতার মধ্যে রাজশেখর বসু মধ্যম, আমরা মেজদা বলিতাম; ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু কনিষ্ঠ। সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ। প্রতিদিনই মজলিস বসিত, জমজমাট হইত রবিবার, বৈঠকখানা গমগম করিত, সেদিন সকলের ছুটি। সেই বৈঠকে কত ডাক্তার, কত অধ্যাপক, কত বৈজ্ঞানিক, কত সাহিত্যিক, কত শিল্পী, কত ঐতিহাসিক উপস্থিত থাকিতেন তার ইয়ত্তা নেই। তার নামকরণ করা হইয়াছিল 'উৎকেন্দ্র সমিতি'। প্রথমে একটা ইংরেজি নামই ছিল, বাংলা নামটি দেন রাজশেখরবাবু। সেই মজলিসে চা, দাবা ও তাদের সঙ্গে চলিত মনস্তত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস এবং

সাহিত্যের আলোচনা। প্রতি রবিবার বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি একসঙ্গে দুপুরবেলা সেই মজলিসে উপস্থিত হইতাম। আড্ডাধারী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চিরকুমার যতীন্দ্রকুমার সেন। তিনি প্রতিদিন দুপুরে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার হাতে তৈয়ারী চা আড্ডার একান্ত উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ ভার আর্টিস্ট স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এ দায়িত্ব কাহারও উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার তৃপ্তি ছিল না।

এই বৈঠকে জলধরদা নিত্য আসিতেন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সত্য রায়, অধ্যাপক মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নরেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ডক্টর দ্বিজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পী পুলিনচন্দ্র কুণ্ডু কখনও কখনও আসিতেন। পাটনার অধ্যাপক রঙীন হালদার ছুটি পাইলেই পার্শীবাগানে সমুপস্থিত হইতেন। ক্যাপ্টেন সত্য রায়ের পিতা আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিলেই এখানে আসিতেন। আরও অনেকে থাকিতেন যাঁহাদের সহিত সাহিত্য বা অধ্যাপনার কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু তাঁহারা গল্প এবং কথাবার্তায় আসর সরগরম করিয়া রাখিতেন। জলধরদা অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন, তিনি কানে কম শুনিতেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কানে না যায় এমন সব কথার আলাপ যখনই জমিয়া উঠিত তখনই দাদা বলিয়া উঠিতেন, 'অ্যাঁ কি বলছ ভাই?' মজাদার কথা কদাচিৎ তাঁহার কান এড়াইয়া যাইত।

একদল তাস লইয়া বসিত। ক্যাপ্টেন সত্য রায় ও আমি মাঝে মাঝে দাবা লইয়া বসিতাম। গিরীন্দ্রবাবু কখনও কখনও তাহাতে যোগ দিতেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ কখনও খেলায় আমল দিতেন না। ... বড়দা শ্রী শশিশেখর বসু বড় মজার গল্প করিতে পারিতেন। তিনি ইংরেজি লিখিয়ে, ইংরেজি কাগজে তাঁহার রসরচনা বাহির হইত। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছেন। রবিবাসরীয় যুগান্তরে এখন প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে। সেজদা শ্রী কৃষ্ণশেখর বসু উলাবীরনগরের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পল্লীউন্নয়নের কথা হইলে তিনি মশগুল হইয়া পড়িতেন। শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার মজলিসী গল্প করিতে পারিতেন। ('উৎকেন্দ্র সমিতি', কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩৬০)

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পেশা ও মানসিকতার বহু মানুষের নিবিড় সাহচর্য লেখক এখানেই পেয়েছিলেন। এই একটি আড্ডাই রাজশেখরকে পরশুরাম করার ক্ষেত্রে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরশুরামের গল্পের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য মজলিশী আড্ডার ঢঙ, যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'উৎকেন্দ্র সমিতি' থেকে। এই আড্ডা তাঁর বহু গল্পে হুবহু উঠে এসেছে। আড্ডার মানুষরাই নামান্তরে গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে; কখনও বা উঠে এসেছে স্বনামে স্বমহিমায়। যেমন কেদার চাটুজ্যে। পরশুরামের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় চরিত্র কেদার চাটুজ্যে। বৈঠকি আষাঢ়ে আড্ডার মেজাজে তিনি অসম্ভব কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়েছেন পাঠকদের।

'দক্ষিণরায়' গল্পে কেদার চাটুজ্যে এমনই এক মজার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানার সান্ধ্য আড্ডায় রীতিমতো সাবধানে তাঁর এই গূঢ় অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। বকুলাল দত্ত মারা গেছেন কাউন্সিলে ঢুকতে পারেননি বলে— এমনটাই সবাই জানে। কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়, তিনি বেঁচে আছেন। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা পাওয়া যাবে। কিন্তু চেনা দুষ্কর। 'বকুবাবু যেদিন পঞ্চান্ন বৎসরে পড়লেন' সেদিন বঙ্গমাতা তাঁকে নির্দেশ দিলেন দেশের কাজ করবার। পরামর্শ দিলেন কাউন্সিলে ঢুকে পড়ার। কলকাতায় সুবিধে করতে না পেরে বকুবাবু সাউথ-সুন্দরবন-কনস্টিটুয়েন্সি থেকে দাঁড়ালেন। ভোটে জেতার জন্য বাবা দক্ষিণরায়ের শরণ নিলেন। বাবা খুশি হয়ে তাঁকে জাতে তুলে নিতে চাইলেন। ব্রাহ্মণবেশি বাবা দক্ষিণরায় নিজরূপ ধরে "তাঁর ল্যাজটি চট করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন। বাবা বললেন— যাও বৎস, এখন চরে খাও গে।... পরদিন সকালে ক-জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধুঁকছে। চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটিবাবুর বাড়ি। তিনি বললেন— এমন বাঘ তো দেখিনি, গাধার মতো রং। আহা, শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিই। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও, বকশিস মিলবে।"

'বড় অলৌকিক শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়'— এমন একটা ঘটনা বলার পর চাটুজ্যেবাবু নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলেন— "বকুবাবু এখন আলিপুরেই আছেন। আর দেখা সাক্ষাৎ করিনে, — ভদ্রলোককে মিথ্যে লজ্জা দেওয়া।"

এরকম আর একটি কৌতুককর ঘটনা তিনি শুনিয়েছেন 'লম্বকর্ণ গল্পে। তাঁর শোনা গল্প নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাটি বরং তাঁর ভাষায় শুনি—

> আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের এক ছাগল ছিল, তার নাম ভুটে। ব্যাটা খেয়ে খেয়ে হল ইয়া লাশ, ইয়া শিং, ইয়া দাড়ি। একদিন চরণের বাড়িতে ভোজ— লুচি পাঁঠার কালিয়া, এই সব। আঁচাবার সময় দেখি, ভুটে পাঁঠার মাংস খাচ্ছে। বললুম— দেখছ কি চরণ, এখুনি ছাগলটাকে বিদেয় কর— কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর, প্রাণে ভয় নেই? চরণ শুনলে না। গরিবের কথা বাসী হলে ফলে। তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ কোথা গেল। এক বছর পরে মশায়

সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল। শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে। মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা হলুদ, আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়— আঁজি আঁজি ডোরা ডোরা। ডাকা হ'ল— ভুটে, ভুটে। ভুটে বললে— হালুম। লোকজন দূর থেকে নমস্কার ক'রে ফিরে এল।

আসলে বাঘ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব একটা ধারণা আছে। তিনি বলেন— "সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। বাঘ ব'লে একটা ভিন্ন জানোয়ার নেই ও একটা অবস্থার ফের, আরসোলা হ'তে যেমন কাঁচপোকা। আজই তোমরা ডারউইন শিখেছ— আমাদের ওসব ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে।"

কেদার চাটুজ্যে শুধু বাঘের গল্পই করেন না, মোলায়েম প্রেমের গল্পও করতে পারেন। 'স্বয়ংবরা'-য় তিনি এরকমই একটা গল্প বলেছেন। অবশ্য ঠিক গল্প বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকারোক্তি— "গল্প আমি বলি না। যা বলি, সমস্ত নিছক সত্য কথা"। পাঞ্জাবমেলে একবার তিনি অপরূপ সুন্দরী এক মেমসাহেবের পাল্লায় পড়েছিলেন। 'দেবীর মতো সেই মেমসাহেবের একহাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট'। তার পাণীপ্রার্থী দুই সাহেবের ট্রেন কম্পার্টমেন্টে মারামারি, শেষে তাঁর কল্যাণে তৃতীয় এক সাহেবের আগমন ও তার সঙ্গে বিয়ের বর্ণনা শুনিয়েছেন কেদার চাটুজ্যে। নব দম্পতিকে 'এক মুটো ঘাস' দিয়ে তিনিই আশীর্বাদ করেছিলেন "মা লক্ষ্মী, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক। বীরপ্রসবিনী হয়ে কাজ নেই মা— ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যেই তোলা থাক। তুমি আর গরিব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,— গুটিকতক শান্তশিষ্ট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর কর।" এরপর মেমসাহেব তার পাকা লঙ্কার মতো ঠোঁট দিয়ে চাটুজ্যের পাঁচদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর...।

কেদার চাটুজ্যে পরশুরামের গল্পে বারবার এসেছেন, আর পাঠকদের নানান মজার সব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। অনেক সময়েই তা সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাঁর ব্যবহৃত সংলাপও উদ্ভট মনে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কখনোই তা বেমানান মনে হয়নি। চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পাঠকের কাছে কৌতুককর মনে হয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈঠকি আড্ডার আবহে পাঠকও নিজের অজান্তে ঢুকে গেছে। কেদার চাটুজ্যের সঙ্গে এক হুঁকোতে তামাক খেয়েছে। অসম্ভব উদ্ভট আষাঢ়ে গল্প বেশ মানিয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন আড্ডায়। তাই লেখক তাঁর অধিকাংশ গল্পেই মজলিশী আড্ডার প্যাটার্ণটি পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছেন। 'দক্ষিণ রায়', 'স্বয়ংবরা' ইত্যাদি গল্প আড্ডার ছলে লেখা। যে গল্প এরকম আড্ডার ঢঙে বলা হয়নি, সেরকম গল্পেও এসেছে মজলিশী মেজাজ। যেমন 'বিরিঞ্চিবাবা', 'লম্বকর্ণ' ইত্যাদি। এর মধ্যে একটা স্বতন্ত্র কাহিনি আছে। গল্প এগিয়েছে ঘটনা বিন্যাসে, কোনো চরিত্রের মুখের বর্ণনায় নয়। তা সত্ত্বেও রক্ষিত হয়েছে আড্ডার আবহ। এই আড্ডা বাঙালির নিজস্ব। তার জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই

পরশুরামের গল্প বাঙালিকে চিনিয়ে দেয়। মধ্যবিত্ত বাঙালির বিশেষ সময়কালকে চিনিয়ে দেয়। যে সময়কালে বাঙালিদের আড্ডা দেওয়ার মেজাজ ও সময় ছিল। এক রকম মানসিক দায়ও ছিল বলা যায়।

পরশুরামের গল্পে কিছু স্থায়ী চরিত্র আছে যারা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। কেদার চাটুজ্যে, বংশলোচন, নগেন, উদো ইত্যাদি চরিত্ররা একই আড্ডার সদস্য। এভাবে একটি নির্দিষ্ট আড্ডাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন লেখক। আর এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে মানুষের আচার-আচরণের অসংগতি, হাস্যকর কিছু দুর্বলতাকে ভুলে ধরেছেন। আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অসংলগ্নতাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নির্বিকারভাবে। এবং সে সম্পর্কে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। কখনো কোনো গল্পে পরশুরাম নীতি কথা বলেননি। অন্তত স্পষ্ট করে তো নয়ই। পরশুরাম নিজে অন্তরালে থেকে চরিত্রগুলিকে পাঠকদের দরবারে হাজির করেছেন তাদের সবরকম চারিত্রিক খুঁটিনাটিসহ। তারা নিজেদের মতো করে কথা বলেছে, হেঁটেছে, কাজকর্ম করেছে। তারা লেখকের হাতের পুতুল নয় বলেই তাদের দুর্বলতাগুলিও ঢাকা পড়েনি। তাই তারা এতটা আকর্ষণীয়, সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিহীন। সেক্ষেত্রে শুধু মনুষ্য চরিত্র নয়, ভূতপ্রেত থেকে শুরু করে মনুষ্যেতর ছাগল হনুমান বাঘ ইত্যাদি চরিত্ররাও লাগামছাড়া— স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ। তাদেরও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে। বোধবুদ্ধি আছে। মান-অপমান আছে। সর্বোপরি আছে একটা সতেজ মন।

এই মনুষ্যেতর চরিত্রকে নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'লম্বকর্ণ'। কাহিনির বিন্যাস ও রচনাভঙ্গি গল্পটিকে আশ্চর্য হাস্যোজ্জ্বলতায় মণ্ডিত করেছে। রায়বাবাদুর বংশলোচন সান্ধ্যভ্রমণে গিয়ে একটি ছাগলকে দেখতে পান। বর্মাচুরুট চামড়ার সিগারকেস থেকে শুরু করে গীতার তিনটি অধ্যায় পর্যন্ত খেয়ে ফেলে সে। বাধ্য হয়ে সেই ছাগলকে রায়বাহাদুর এক কনসার্ট পার্টিকে দিয়ে দেন। তারাও পরদিন ফেরত দিয়ে যায়। তাদের "ঢোলের চামড়া কেটে লব্বই টাকার লোট"ও খেয়ে ফেলেছে সে। তার জন্য রায়বাহাদুরকে একশ টাকা ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। এ ছাগলকে তো রাখা যায় না। তাছাড়া স্ত্রী মানিনীর আপত্তি। আবার এক বিকেলে তিনি লম্বকর্ণকে যেখান থেকে পেয়েছিলেন সেখনেই ছেড়ে দিলেন। আর তার গলায় কাগজ লিখে টিনের কৌটোয় ভরে দিলেন— "আল্লা কালী যিশুর দিব্য ইহাকে কেহ মারিবে না।" ফেরার সময় বংশলোচন ঝড় জল-বজ্রপাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। লম্বকর্ণ বাড়ি এসে খবর দিলে বন্ধুরা গিয়ে উদ্ধার করে তাঁকে। আর লম্বকর্ণ এ বাড়িতে স্থায়ী জায়গা করে নেয়।

সেই রাতেই কয়েকদিন ধরে চলা দাম্পত্য অভিমানের নিরসন ঘটে। মানিনীর মান ভঞ্জন হয়। যে মানিনী এ কদিন আলাদা বিছানায় শুয়েছিলেন তিনি বলেন— "আজ আর দোতলায় উঠে কাজ নেই। ও ঝি, এই বৈঠকখানা ঘরে বড় করে বিছানা করে দে তো।

আর দেখ, আমার বালিশটাও দিয়ে যা। আঃ চাটুজ্যে মিনসে নড়ে না। ওকি— সে হবে না— এই গরম লুচি কখানি খেতেই হবে, মাথা খাও। তোমার সেই বোতলটায় কী আছে— তাই একটু চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে নাকি?"

যে লম্বকর্ণকে একদিন দূরদূর করে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তার শিং কেমিক্যাল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন মানিনী। তার জন্য সাবান ফিনাইল ব্যবস্থা করলেন। লোকে বিদ্রুপ করলে লম্বকর্ণ তা আর গ্রাহ্য করে না। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করলে বলে— "ব ব ব— অর্থাৎ যত ইচ্ছা হয় বকিয়া যাও, আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।" প্রায় একই কাহিনি পরম্পরায় লেখা 'গুরুবিদায়' গল্পটি। খল্বিদং স্বামীকে তাড়ানোর কোনও উপায় যখন কেউ খুঁজে পাচ্ছে না তখন লম্বকর্ণই তার প্রচণ্ড গুঁতোয় স্বামীজীকে পালাতে বাধ্য করে।

খল্বিদং স্বামীর মতো ভণ্ড স্বামীজীর ভিড় দেখা গেছে পরশুরামের গল্পে। আর পরশুরামের লেখায় কিছুমাত্র যদি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ থাকে তা প্রধানত এই ঠকবাবাদের প্রতি-ই। তাঁর লেখায় ব্যক্তিগত বিদ্রুপ নেই। আদিরস নেই। কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত নেই। রাজনীতি ধর্মগোষ্ঠীর বিচ্যুতি দূর করবার জন্য অনেক সময় তিনি ব্যঙ্গের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের ঝাঁঝও তীব্র নয়। তার প্রথম গল্প 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এ এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এই গল্পের শ্যামানন্দ স্বামী পরশুরাম সৃষ্ট প্রথম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁর সকল ভণ্ডামি ধর্মীয় চালিয়াতি খুব সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে এ গল্পে। শ্রমলাঘবের জন্য তিনি "একটি সিন্দূরচর্চিত রবার স্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বারে দুর্গানাম" লেখেন। "স্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রী শ্রী দুর্গা' খোদিত আছে, সুতরাং ৯ বার ছাপলেই কার্যোদ্ধার হয়।" ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করা এঁর পক্ষেই সম্ভব। মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা রটিয়ে শেয়ার বিক্রি করেন তিনি। তাঁর মন্দির নিয়ে ব্যবসার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও অদ্ভুত— "যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে তাহা ভিন্ন আরও নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান হাট বাজার অতিথিশালা মহাপ্রসাদ বিক্রয় প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদভিন্ন by product recovery-র ব্যবস্থা থাকিবে। "সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে বোতলে প্যাক করা হইবে। বলীর জন্য নিহত ছাগ সমূহের চর্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড-স্কিন প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। হাড় হইতে বোতাম হইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।"

এই গল্পেরই আর একটি ভণ্ড ঠক চরিত্র শ্যামানন্দের দোসর ভেজাল ব্যবসায়ী বাবু গণ্ডেরিরম বাটপারিয়া। তার নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে চরিত্রবৈশিষ্ট্য। ভেজাল ব্যবসা করলেও তাঁর নিশ্চিত ধারণা তিনি পুণ্যবান। কারণ, তিনি "হর রোজ গীতা আউর রামচরিতমানস" পড়েন, 'রামভজনভি' করেন। তাঁর কথায়— "পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেবসা তো করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ঘই বনে হাথরস্‌মে। আমি

ন আঁখসে দেখি, ন নাকসে শুংখি— হনুমানজি কিরিয়া। হামি তো সিফ মহাজন আছি— রুপয়া দে কর খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্সাভি লি। যদি ফিন কুচ দোষ লাগে— জানে রন্ছোড়জী— হামার পুন্ভি থোড়া-বহুত জমা আছে। একাদসী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান খয়রাতভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া— লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে।" যদিও এই ধর্মশালা তৈরি হয়েছে আশরফিলাল ঠুনঠুনওয়ালার টাকায়। "লেকিন বানিয়ে দিয়েছে কোন? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে? সব হামি। আশরফি হামার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ দিয়েছি তব না রুপয়া খরচ কিয়েছে।" বাঙালির ধর্মচর্চা সম্পর্কে তার মন্তব্য— "বাঙ্গালী ধরম জানে না। তিস রুপয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে! হামার জাত রূপয়াভি কামায় হিসাবসে, পুনভি করে হিসাবসে।"

বাঙালির ধর্মচর্চা নিয়ে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে গণ্ডেরি নিজে নিজেকে ব্যঙ্গ করেছে। ব্যঙ্গ করেছে নিজের সম্প্রদায়কেও। কিন্তু এরমধ্যে লেখকের অবাঙালি বিদ্বেষ খোঁজার চেষ্টা হাস্যকর। কারণ, গণ্ডেরির পাশে শ্যামানন্দ স্বামীকেও এনেছেন তিনি। এই ধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে পরশুরামের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সম্ভবত বিরিঞ্চিবাবা। বাংলা সাহিত্যে এরকম ভণ্ড সাধুবাবা খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বাবার বয়সের কোনও গাছপাথর নেই। মনু-পরাশর-তুলসীদাস সকলকেই তিনি দেখেছেন। এমনকি ঝগড়া-হাসি-ঠাট্টাও করেছেন। সূর্য বিজ্ঞান তাঁর মুঠোর মধ্যে। "একবার মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত আমায় বললে— নীললোহিত কল্পে কি? না, শ্বেত বরাহ কল্প তখন সবে শুরু হয়েছে বৈবস্বত বললে— মানুষ তো সৃষ্টি করলুম, কিন্তু ব্যাটারা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি? — চারিদিকে জল থই থই করছে। আমি বললুম— ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র-সূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।"

এ হেন শক্তিধর স্বামীবাবার কাছে শিক্ষিত গুরুপদবাবুর মতো মানুষ নত হবে এতো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু পরশুরাম এখানেই থেমে যাননি। শেষ পর্যন্ত বাবার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তাঁর সকল ভণ্ডামি ধর্মীয় ছদ্মবেশ টেনে ফেলে দিয়েছেন। গুরুপদবাবুর করুণার পাত্রে পরিণত করেছেন বিরিঞ্চিবাবাকে।

এ গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে আরও অনেক সাধুবাবার কথা। যেমন— মিরচাইবাবা। "তিনি খান স্রেফ করাতের গুঁড়ো।" তড়িতানন্দঠাকুর ইত্যাদি বাবাদের নাম এবং খাদ্যাভ্যাস যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করে। এ গল্পে ধর্ম নিয়ে জুয়চুরির আর একটি মজার প্রসঙ্গ এসেছে যা গণ্ডেরির বক্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হরিহর ছত্রের মেলায় বাঁশের খাঁচায় শ'দুই কাক রেখে বিক্রি করছে একজন। "এই কাগ খাঁচায় কয়েদ রয়েছে, দু-দু' আনা খরচ করে যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে জীবকে বন্ধনদশা হতে মুক্তি দাও,

তোমারও মুক্তি হবে।" মোক্ষলাভের এমন বিচিত্র উপায় পরশুরামের পক্ষেই দেখানো সম্ভব।

প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে 'মহাবিদ্যা' গল্পটির কথা। এখানে অবশ্য 'জগদ্‌গুরু' কোনোকম ভাঁড়ামি করেননি। মিথ্যাচার করেননি। রাখঢাক না করে স্পষ্টতই বলেছেন— মহাবিদ্যায় মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু একে ঘষে মেজে পালিশ করে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মে মহাবিদ্যা এক স্তর হতে উচ্চতর স্তরে পৌঁছেছে। জানিয়ে শুনিয়ে সোজাসুজি কেড়ে নেওয়ার নাম ডাকাতি— দেশের জন্য যে ডাকাতি, তার নাম বীরত্ব— নিজে লুকিয়ে থেকে কেড়ে নেওয়ার নাম চুরি— ভালোমানুষ সেজে কেড়ে নিয়ে শেষে ধরা পড়ার নাম জুয়াচুরি— আর যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, লোকে জয় জয়কার করে— সেটা মহাবিদ্যা।

কর্মক্ষেত্র বেঙ্গল কেমিক্যালের অফিস এবং উৎকেন্দ্র সমিতির বাইরে পরশুরাম খুব বেশি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেননি— একথা হয়তো ঠিকই। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। বস্তুত তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি পাঠক মননে সহজে গেঁথে যায়। প্রথম গল্প সংকলন 'গড্ডলিকা' (১৩৩২) প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রবাসী' পত্রিকায় একটি আলোচনায় লিখেছিলেন— "বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন-কি, যে পাঁঠাটা কন্সর্টওয়ালার ঢাকের চামড়া ও তাহার দশ টাকার নোটগুলোকে চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে আমারই টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া আমার কবিতার খাতাখানি চিবাইতে দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।" 'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন— "পরশুরামের ছবি আঁকবার হাত অতি পরিষ্কার। তিনি দুটি চারটি টানে একটি লোককে চোখের সম্মুখে খাড়া করে দেন। তাঁর ছবিতে রেখা ও বর্ণের বাহুল্য নেই। তাঁর হাতের প্রতি রেখাটি পরিস্ফুট, প্রতি বর্ণটি যথোচিত।"

পরশুরামের গল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মেদহীনতা। প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও তিনি বলেননি। রচনাভঙ্গিতে কৌতূকের আমেজ থাকলেও গল্পগুলির বুনোট বেশ টাইট। ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাস অনেক সময়ই স্বাভাবিক যুক্তি মেনে চলেনি; কিন্তু প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা আঁটোসাটো একটি ফ্রেমে মোড়া রয়েছে। আর এই ফ্রেমটাই পরশুরামের গল্প। হাসির গল্পের ক্ষেত্রে এরকম নিখুঁত বিন্যাস খুব বেশি দেখা যায় না। লেখক পরশুরাম ও মানুষ রাজশেখর বসু কারোর মধ্যে মুহূর্তের জন্যও প্রগলভতা ছিল না, চাপল্য ছিল না। কর্মজীবনে তিনি নিজের কাজ সম্পর্কে গভীর মনোযোগী ও সচেতন ছিলেন। কাজের বাইরে কোনো রকম অ-কাজকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। এ প্রসঙ্গে শ্রী সুহৃৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একটি অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর কথায়— "যখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, সেই সময় একদিন আমায় **Bengal Chemical**-এর

আপিসে— যে আপিসের তিনি সে সময়ে Manager ছিলেন— কার্যবশতঃ দেখা করতে যেতে হয়েছিল। কাজের কথা হয়ে যাবার পর আমি— যেমন আমাদের বেশির ভাগ লোকরই অভ্যাস— তাকে দু-একটা বাড়ির খবরের কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তিনি তখনই বলে দিলেন— ওসব কথা তো আপিসের নয়— আপিসের সময় নষ্ট না করে বাড়িতে জিজ্ঞেস করবেন— এই বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।" ব্যক্তিজীবনের প্রবল ব্যক্তিত্ব-গাম্ভীর্য পরশুরামের লেখার মধ্যেও সমান ভাবে আছে। তাই তিনি নিজে না হেসে পাঠকদের হাসাতে পেরেছেন। মানুষের সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনকে নিয়ে মজা করতে পেরেছেন। এমনকি নিজেকে নিয়ে মজা করতেও কুণ্ঠিত হননি। রসায়নিককে নিয়ে ব্যঙ্গ করা আসলে তো নিজেকেই ব্যঙ্গ করা। নিজের পেশা ইত্যাদিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা একজন সৎ ও সাহসী মানুষের পক্ষেই সম্ভব। রসায়নিকের বুদ্ধির উদ্ভট প্রয়োগের মাধ্যমে গল্পে হাস্য-ঘন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে বৈজ্ঞানিক বিপিন B.Sc., A.S.S (U.S.A) বলেছে কুমড়োর খোসাকে কস্টিক পটাস দিয়ে বয়েল করলে ভেজিটেবিল সুপ হতে পারে। একজন ASS বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এরকম হাস্যকর কথা বলা অসম্ভব এও যেমন ঠিকই, তেমনি এও ঠিকই যে একজন রসায়নিক না হলে এক্সপেরিমেন্টের এমন সূত্র উদ্ভাবন করা যাবে না। বিপিন অবশ্য ওই বিদেশি ডিগ্রিটি টাকা দিয়ে কিনে এনেছে— "পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাটকা থেকে তিনটে হরফ আনিয়েছে।" 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে প্রফেসর ননির এক্সপেরিমেন্ট আরও মজার। লেখকের বর্ণনায়—

নিবারণ ও সত্য অন্দরে গিয়া দেখিল উঠানের এক পাশে একটি উনানের উপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সবুজরঙের কোনও পদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। ননির স্ত্রী নিরুপমা তাহা কাঠি দিয়া ঘাঁটিতেছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়াম আছে, তাহা হইতে একটা রবারের নল আসিয়া ডেকচির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রফেসর ননি মালকোঁচা মারিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিবারণ বলিল— 'একি বউদি, এত শাগের ঘণ্ট কার জন্য রাঁধছেন?'

নিরুপমা বলিল— 'শাগ নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে। ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।'

নিবারণ। সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?

ননি বলিল— 'নিবারণ, ইয়ার্কি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।

নিবারণ। সকলেই তো প্রফেসর ননি বা রোমান্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।

ননি। আরে ও কি ঘাস থাকবে? প্রোটীন সিন্থেসিস হচ্ছে। ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো-গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্। হেক্সা-হাইড্রক্সি-ডাই-অ্যামিনো।

নিবারণ। থাক, থাক। হারমোনিয়ামটা কী জন্য?

ননি। বুঝলে না? অক্সিডাইজ করবার জন্যে। নিরু হারমোনিয়ামটা বাজাও তো।

নিরুপমা হারমোনিয়ামের পেডাল চালাইল। সুর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভিতর বগবগ করিতে লাগিল।

পরশুরামের গল্পের চরিত্রদের নামকরণও অনেক সময় কৌতুককর হয়েছে। যেমন, চুকন্দর সিং, পেলব রায়, ললিমা পাল (পুং), গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া ইত্যাদি নামগুলি বেশ হাস্যকর। রূপ-চেহারার বর্ণনা ও উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন লেখক। যেমন—

(ক) নৃত্যকালীর রং ছিল পানতুয়ার মতো। কিন্তু ডাকিনীর রং যেন পানতুয়ার শাঁস। (ভুশণ্ডীর মাঠে)

(খ) ...গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ, সুপুষ্ট গালের আড়াল হইতে দুইটি উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারিতেছে। দু-পয়সা দামের শিঙাড়ার মতো সুবৃহৎ নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে খাঁজে খাঁজে চিবুকের স্তর নামিয়াছে। (বিরিঞ্চিবাবা)

(গ) ...মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতন দুগাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতী গামছা— কাঠ ফাঠ জানি নে বাবা। স্পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো করে প'রা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম, —হ্যাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেবনয়, একবারে জ্বলন্ত হাউই-এর কাঠি... ফিক করে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচাভুট্টার দানা দেখা গেল। (স্বয়ংবরা)

(ঘ) 'হজৌর' বলিয়া হাঁক দিয়া চুকন্দর সিং হাজির হইল। শীর্ণ খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, গালপাট্টা দাড়ি, পাকানো গোঁফ, জাঁকালো গলা এবং ততোধিক জাঁকালো নাম— ইহারই জোরে সে চোট্টা এবং ডাকুর আক্রমণ হইতে দেউড়িকে রক্ষা করে। (লম্বকর্ণ)

(ঙ) ... তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি. এ. পাস করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি টাইপিস্টের খোঁপার মতন মাথার দু-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তারপর মুগার পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, সবুজ নাগরা ও লাল ফউন্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধরিল— ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। সার আশুতোষ এক ভলুম এনসাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। (কচিসংসদ)

চরিত্রগুলির সংলাপে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য ভাষা মিশিয়ে উদ্ভট হাস্যকর এক ভাষা

তৈরি করেছেন লেখক। গণ্ডেরির বাংলা-হিন্দি মিশ্রভাষার সংলাপ দেখেছি। 'কচিসংসদে' ব্রজেনের স্ত্রীর ভাষায় বারবার ইংরেজি 'হোয়াট' শব্দ এসে কৌতুককর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আরও মজার 'উলট-পুরাণ'-এর উড়িয়া সার্জেন্টদের সংলাপ— "এ সাহেবঅ, ওপাকে যিবঅ তো ডণ্ডা খিবঅ।" উচ্ছ্বাসহীন বাস্তবধর্মী অসাধারণ সব সংলাপ রচনা করেছেন তিনি।

পরশুরামের গল্পের বর্ণনাভঙ্গি ও ভাষ্যব্যবহার হাস্যরসকে বর্ণময় করে তুলেছে। কৌতুকোজ্জ্বল বর্ণনাভঙ্গির কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) শাকভাজা, কড়াইয়ের ডাল— এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট! বেশ বেশ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি? আয়ুর্বেদে আছে— পনসে কদলং কদলে ঘৃতম। কদলীভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছভাজা— বাঃ রোহিতাদপি রোচকাঃ সদ্যভর্জিতাঃ। ওটা কীসের অম্বল বললে— কামরাঙ্গা? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্র গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি। অম্বল জিনিসটা আমার সয়ও না— শ্লেষ্মার ধাত কিনা। উস্‌প, উস্‌প, উস্‌প। প্রাণায় অপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনে ভু জনার্দনম্। (শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড)

(খ) চৌরঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। (কচিসংসদ)

গল্পের বিন্যাসে মাঝে মাঝে কৌতুককর কবিতা এনেছেন প্রাসঙ্গিকভাবে। 'দক্ষিণরায়' গল্পে রায়মঙ্গল থেকে পাঁচালি শুনিয়েছেন। বলাবাহুল্য এই রায়মঙ্গল পরশুরামেরই লেখা। যেমন—

এতেক কহিয়া প্রভু রায় মহাশয়
ধরিলেন নিজ রূপ দেখে লাগে ভয়।
পরবত প্রমাণ দেহ মধ্যে ক্ষীণ কটি,
দুই চক্ষু ঘোরে যেন জ্বলন্ত দেউটি।
হলুদ বরণ তনু তাহে কৃষ্ণরেখা,
সোনার নিকষে যেন নীলাঞ্জন লেখা।
কড়া কড়া খাড়া খাড়া গোঁফ দুই গোছা,
বাঁশঝাড় যেন দেয় আকাশেতে খোঁচা।
মুখ যেন গিরিগুহা রক্তবর্ণ-তালু,

তাহে দন্ত সারি সারি যেন শাঁখ আলু।

এ গল্পে কেদার চাটুজ্যে বলেছেন 'রায়মঙ্গলে'র এই পুঁথি তিনশো বছরের পুরোনো। "সেটা নেবার জন্য চিমেশ মিত্তির ঝুলোঝুলি। ছোকরা তার ওপর প্রবন্ধ লিখে ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তার উপাধি পেতে চায়। দেড়শ অবধি চেয়েছিল, আমি রাজী হইনি। প্রবন্ধ লিখতে হয় আমিই লিখব। নাড়ীজ্ঞান আছে ডাক্তার হতে পারলে বুড়ো বয়সের একটা সম্বল হবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রির সঙ্গে কেদার চাটুজ্যে একাকার করে ফেলেছেন চিকিৎসকের ডিগ্রীকে। এভাবে কথার মারপ্যাঁচে পরশুরাম অবলীলায় হাসির ভিয়েনে ডুবিয়ে আনেন তাঁর গল্পের আখ্যান ও চরিত্রদের।

'ভূশণ্ডীর মাঠে'— আর পাঁচালি নয়, পাখোয়াজের বোলে চৌতালে সাজিয়েছেন পদ্যের বিন্যাস।

ধা ধা ধিন্ তা কৎ তা গে, গিন্নী ঘা দেন কর্তা কে।
ধরে তাড়া ক'রে খিটখিটে কথা কয়
ধূর্তা গিন্নী কর্তা গাধারে।
ঘাড়ে ধ'রে ঘন ঘন ঘা কত ধুম্ ধুম্ দিতে থাকে।
টুঁটি টিপে ঝুঁটি ধরে উল্‌টে পাল্‌টে ফ্যালে
গিন্নী ঘুঘুটির ক্ষমতা কম নয়;
ধাক্কা ধুককি দিতে ত্রুটি ধনী করে না
নগণ্য নির্ধন কর্তা গাধা—

গল্পের পাশাপাশি পরশুরাম বেশ কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। সেগুলিও বেশ মজা। 'জামাইবাবু ও বৌমা' নামের দীর্ঘ কাহিনি-কাব্যটির প্রথমেই কবি নির্দেশ দিয়েছেন— "ন্যাকা ন্যাকা সুরে পড়িতে হইবে।" এরকম সাবলীল কথাবার্তার মধ্যে অতর্কিতে হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য ছুঁড়েছেন পরশুরাম, তা গল্প ও কবিতা উভয়ক্ষেত্রেই।

শেষদিকে কিছু স্যাটায়ারধর্মী লেখা লিখলেও পরশুরামের অধিকাংশ গল্পে আছে বিশুদ্ধ হাস্যরস। বোধ-রুচি ও বৈদগ্ধ্যে বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক গল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী পরশুরাম। রসরাজ। রাজাধিরাজ। আজও বাঙালির মুখে মুখে তাঁর গল্পের বহু চরিত্রের নাম, সংলাপ। আজও সমান জনপ্রিয় তিনি। এখনো সরস গল্প পড়তে হলে পরশুরামকে স্মরণ করি আমরা।